The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi
Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে লায়লী-মজনু: অচরিতার্থ প্রেমের চারিত্র্য

[Laili-Majnu in Bangla Romantic Pronayopakhyan: The Character of Ungratified Love]

Ahammad Sharif
PhD Fellow, Department of Bangla, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 03 July 2024
Received in revised: 26 February 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:
Bengali romance poetry, Layli Majnu, Love story, Unrequited love, Lamentation, Love, Howl

ABSTRACT

Laili-Majnu by Daulat Ujir Bahram Khan is a unique creation in medieval Bengali romance poetry. In terms of readership, the poem is equally appreciated not only in Middle Ages but also in modern era. Based on Arabian folklore, the main theme of the poem is the eternal love story of Laili and Majnu. Majnu, madly in love with Laili, has taken on the guise of a lunatic. Laili, too, has actively contributed to the fulfilment of their love. Yet, their love remained unrealised due to the constraints imposed by social norms, familial expectations, and rigid moral codes. The anguish of these two unfulfilled hearts has infused the desert landscape with a profound sense of sorrow. This agony has transcended the barren wilderness of the desert to echo across lands and through the passage of time. Laili-Majnu pair is unique as a love analogy. Laili-Majnu's unrequited love is not in union, but in separation. Their lives have been through unfulfilment, wailing and lamentation for love. The body is perishable, the soul is imperishable; So is the love story of Laili-Majnu. 'A corpse of love doesnot sink in water' is more applicable in the case of Laili-Majnu. The love character of the poem has been explained in the article.

রোমান্স (Romance) লঘু কল্পনার বিষয়। বস্তুজগতের বাইরের জগত, দেখার বাইরের যে অদেখার জগত সেখানেই অলৌকিক রহস্যের অবস্থান। আর এ রহস্যভেদের একমাত্র উপায় কল্পনাশক্তি। প্রত্যক্ষের সীমানা ছাড়িয়ে কোনো এক অতীন্দ্রিয়ের জগতকে, অধরার জগতকে কল্পনার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখাই রোমান্টিকতা। রোমান্টিসিজমের মধ্যে রয়েছে রহস্যময়তা, বিস্ময় ও কল্পনা। যা চর্মচোখে দেখা যায় তাই সবকিছু নয়, দেখার বাইরেও অনেক কিছু রয়েছে। ঘটনার পেছনে যেমন ঘটনা থাকে তেমনি বস্তুর পেছনে প্রকৃত রূপ লুকিয়ে থাকা অসম্ভব কিছু নয়। বস্তুজগতকে যে রূপে দেখা যায় সেটাই তার আসল রূপ নয়। বরং এ দেখার বাইরেও অনেক কিছু থাকে। প্রকৃতির পেছনে যে অতিপ্রাকৃতের হাতছানি তা অদৃশ্য বটে কিন্তু তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। অনুভূতির কান দিয়ে তা শুনতে হয়, অনুভূতির চোখ দিয়ে তা দেখতে হয়। অনুভূতির জগত থেকেই রোমান্সের সৃষ্টি। সাহিত্যের সংযোগ হৃদয়ের সঙ্গে। ক্লাসিক সাহিত্য মহান চরিত্র বা বিষয়ের অবতারণা করে আমাদের মনকে প্রশান্তির উচ্চস্তরে নিয়ে যায় এবং ভাবাবেগবর্জিত সংযম দ্বারা আমাদের হৃদয়কে করে সংযত। অন্যদিকে রোমান্স আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, আমাদের কল্পনাকে করে অনুপ্রাণিত। ক্লাসিকের মধ্যেও রোমান্টিকতার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। খাবার না খেলে যেমন মানুষ বাঁচে না ঠিক তেমনি কল্পনা ছাড়াও মানুষ থাকতে পারে না। 'জীবনের বাস্তব রূপের উপর কল্পনার আরোপ চিত্রিত করে রহস্যময় কোনো চেতনার অনুসন্ধানের মাধ্যমে কল্পনার আলোয় জীবনকে বাস্তবাতীত করে দেখার ব্যাপারটাই রোমান্টিসিজম বা রোমান্টিকতা।'[১] ইউরোপে উনিশ শতকে রোমান্টিক চিন্তাচেতনার বিকাশ শুরু। বাংলা রোমান্সের সৃষ্টি সম্পর্কে সমালোচক বলেন:

> ইউরোপে যেমন করে খ্রিষ্টান সাধু-সন্তদের জীবন ও অলৌকিক-অদ্ভুত-অতিপ্রাকৃত কার্যাবলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বিশাল কাহিনীর সমাবেশ, তেমনি প্রাচ্যে মুসলিম পীর দরবেশ, সুফিদের জীবনীগ্রন্থ 'তাজকেরাতুল আওলিয়া', বড়পীর সাহেবের জীবনী অবলম্বনে সেদিন ঘটে অলৌকিক-অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও কাহিনীর সমাবেশ। অনেক কবি এসব উপাদান সংগ্রহ করে রোমান্সসাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।[২]

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের কবিগণ প্রায় সবাই ছিলেন দরবারি কবি। রাজ দরবারকেন্দ্রিক সামন্তবাদী প্রভুগণ রূপসৌন্দর্য, যুদ্ধবিগ্রহ, পরকীয়া, অলৌকিকতা ও নায়কের দুঃসাহসিক নানা অভিযাত্রা এবং বহু কষ্ট স্বীকার করে শেষ পর্যায়ে প্রেমিকা তথা

বাঞ্ছিত দয়িতাকে পাওয়ার আনন্দে হতেন উদ্বেল। তাই রোমান্টিক ধারার কবিগণ তাঁদের লেখার বিষয় নির্বাচন করতেন দরবারি রুচি অনুযায়ী। বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত সামন্তবাদী প্রভুদের কাছে ঐ সমস্ত দুঃসাহসিক, শিহরণমূলক কাহিনি ছিলো পরম উপাদেয় ও চরম প্রাপ্তির বিষয়।

বাংলায় রোমান্সধর্মী কাব্যের শুরু পনেরো শতকে কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের হাতে। মূলত মুসলিম কবিদের দ্বারাই এধারা সৃজিত হয়। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন প্রণয়কাব্য। এ সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত:

> ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ-এ তিনটে প্রণয়-কাহিনী বিশ্ব মুসলিমের ঘরোয়া সম্পদ। এ-তাদের কিতাব পড়ে পাওয়া বিদ্যা নয়, পুরুষানুক্রমে ধরে রাখা রিখত-ঐতিহ্যের সম্পদ। রূপকথার মতো এসব কিস্সা-কাহিনী শ্রেণী ও বয়স অবিশেষে সব নারী-পুরুষের মুখে মুখে আজও উচ্চারিত। লায়লী-মজনু ও শিরি-ফরহাদ-খসরুর প্রণয়কথা ইরানে উদ্ভূত এবং সুফী কবিদের লালনে পুষ্ট। প্রেমোন্মত্ত অর্থে বাঙলায় 'মজনু' শব্দের বহুল ব্যবহারও এই লায়লী-মজনু কিস্সা শোনার ফল।[৩]

মধ্যযুগের দেব-দেবী নির্ভর সাহিত্যের ব্যতিক্রম প্রণয়কাব্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্মীয় প্রভাব এতটাই বেশি ছিলো যে চাঁদ সওদাগরের মতো প্রবল ব্যক্তিত্ববান চরিত্রও দেবতার প্রভাব এড়াতে পারেননি। অপরদিকে ইসলাম ধর্মে কোনো দেব-দেবীর স্থান নেই। একেশ্বরবাদিতাই ইসলামের মূলভিত্তি। তাই এখানে অবতারবাদের প্রসঙ্গ অবান্তর। রোমান্সধর্মী কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে মানবধর্ম ও জীবনধর্ম। আরবি-ফারসি সাহিত্যের কোনো কোনো রোমান্স প্রচ্ছন্নভাবে সুফি ভাবধারার। কিন্তু 'ফারসী প্রণয়োপাখ্যানগুলো (কোন কোন হিন্দি আখ্যায়িকাও) প্রধানত সুফীতত্ত্বের রূপকাশ্রিত হলেও বাঙলায় তর্জমা হয়েছে লৌকিক প্রণয়োপাখ্যানরূপেই। তত্ত্বকথাকে এভাবে রসকথায় রূপান্তরের প্রবণতার মধ্যে জীবনবাদী বাঙালী মানসের স্বরূপ ধরা পড়েছে।'[৪] আরবীয় ও ইরানীয় তথা মুসলিম ঐতিহ্য এবং বাংলায় প্রচলিত হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য থেকে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের কবিগণ উপকরণ নিয়ে প্রণয়কাব্যের সুদৃঢ় ইমারত গড়েছেন। মধ্যযুগের ধর্মনির্ভর সাহিত্যে 'ফার্সি ও হিন্দী-আওধী সাহিত্যের রোমান্টিক প্রণয়কাহিনির ভাণ্ডার থেকে রস আহরণ করে মুসলমান কবিরা বাংলা সাহিত্যের রুচিবদল করেছিলেন।'[৫] বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, কবি জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* এবং *বৈষ্ণবপদাবলি* দ্বারা রোমান্সকারগণ হয়েছেন অনুপ্রাণিত। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের মূল উপজীব্য প্রেম। এ প্রেম মানব-মানবীর প্রেম। দুঃখের অনলে পুড়ে খাঁটি সোনায় পরিণত হওয়া মহান প্রেমেরই জয়গান ঘোষিত হয়েছে প্রণয়কাব্যে। এ সম্পর্কিত ড. আহমদ শরীফ-এর মত প্রণিধানযোগ্য:

> বাহুবল, মনোবল, প্রণয়বাঞ্ছা ও রাগনিষ্ঠা পাথেয় করে প্রেমিককে অতিক্রম করতে হবে মৃত্যুসঙ্কুল 'গিরি-মরু-কান্তার ও দুস্তর পারাবার।' এরই ফলে রূপ রসে, কাম প্রেমে ও মোহ আত্মিক আকর্ষণে হয় উন্নীত। এভাবেই ঘটে প্রেমতীর্থে উত্তরণ। সোনা যতই জ্বলে ততই বাড়ে তার ঔজ্জ্বল্য তেমনি বাধাবিপত্তি যতই হয় দুর্লঙ্ঘ্য প্রেমের উপলব্ধি ততই পায় ব্যাপ্তি ও গভীরতা। খাঁটি সোনার মত দুঃখের দাহনেই মেলে খাঁটি প্রেম।[৬]

এই সুকঠিন প্রেমের সাধনাই করেছেন প্রণয়কাব্যের নায়ক-নায়িকারা। প্রেমের দুর্গমপথে দুঃসাহসিক যাত্রায় মুগ্ধ হয়েছেন পাঠক ও ভক্তবৃন্দ; কখনোবা তাঁরা হয়েছেন আবেগাপ্লুত।

বাংলা রোমান্সধর্মী কাব্যধারায় দৌলত উজির বাহরাম খাঁ একজন শক্তিশালী কবি। তিনি ষোল শতকে *লায়লী-মজনু* কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যটি বাংলা রোমান্সধর্মী কাব্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কবির রুচিশীল মননশীলতা ও বাক-বৈদগ্ধ্যের পরিচয় কাব্যটিতে পাওয়া যায়। 'বিষয় পরিকল্পনায় বাহরামের কৃতিত্ব নেই। তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশভঙ্গিতে।'[৭] ভাষার শালীনতা ও বিশুদ্ধতা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপক অলঙ্কারের সফল প্রয়োগ, কাহিনির বর্ণনায় ও নাটকীয়তার গুণে কাব্যটি মধ্যযুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্সধর্মী কাব্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 'এ কাব্য বাল্যপ্রেমে অভিশপ্ত দুই বিরহী হৃদয়ের রক্তক্ষরা বেদনার জমাট অশ্রু। এর গীতোচ্ছ্বাস, এর কারুণ্য, এর নীতিনিষ্ঠ, মানবিকতা অভিভূত করে পাঠককে।'[৮] কোনো ধর্ম প্রচার বা দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন কিংবা দেবতার শাপভ্রষ্ট মানব-মানবীর প্রেমলীলা নয়, বরং রক্ত-মাংসে গড়া দুইটি বিরহতাপিত প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ের মর্মজ্বালা কাব্যটির মূল বিষয়।

লায়লী-মজনু কাব্যের কাহিনি আরবীয়। ফারসি কবি রূদ্কীর কাব্যে প্রথম লায়লী-মজনুর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আরবীয় লোকগাথাকে ১১৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম লিখিত রূপ দেন কবি নিজামী গঞ্জভী। এরপরে উক্ত কাহিনি নিয়ে ১৪৮৪ খ্রিষ্টাব্দে কাব্য রচনা করেন আবদুর রহমান জামী। '*লায়লী-মজনু* ফারসী কবি জামীর ঐ নামীয় কাব্যের ভাবানুবাদ। স্থানে স্থানে মূলঘেঁষা অনুবাদ যেমন আছে, স্বাধীন রচনাও তেমন দেখা যায়।'[৯] নিজামী, আমীর খসরূ বা আবদুর রহমান জামী ছিলেন কবির পূর্ববর্তী। হয়তো তাঁদের কাব্যের সঙ্গে কবির পরিচয় ছিলো। 'দৌলত উজির বাহরাম খান সম্ভবতঃ পারস্যের কবিদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।'[১০]

লায়লী-মজনুর প্রেমের সূত্রপাত পাঠশালায়। লায়লীকে প্রথম দেখেই মজনু তার প্রেমে পড়ে যায়। যাকে বলে 'Love at first sight' কারণ শরীরী রূপই প্রেমের মৌলিক ভিত্তি। প্রথমে চোখাচোখি এবং তা থেকে প্রেমের সৃষ্টি 'অন্যে অন্যে

দেখাদেখি/ মজিল দোহান আঁখি/ভাবেত মোহিত হৈল মন।'[১১] এ যেনো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর 'সেদিন চৈত্রমাস' গানের মতো 'প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সে দিন চৈত্রমাস-/তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ॥'[১২] প্রথম দৃষ্টিতেই কী তারা উভয়ে জীবনের 'সর্বনাশ' প্রত্যক্ষ করেছিলো! প্রেম মানসিক প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। প্রেমে পড়লে প্রেমিক-প্রেমিকার নানা উপসর্গ প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন:

> চোখের চকিত চাহনি, আঙ্গুলের হঠাৎ স্পর্শ অথবা এক ঝলক হাসির ফলে মানুষের মস্তক থেকে 'আমফিটামিন' এর মতো এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ স্নায়ুর মধ্য দিয়ে রক্তে প্রবেশ করে। এর সঙ্গে থাকে আরও কয়েকটি পদার্থ যেমন, ডোপামিন, নোরপাইনফ্রিন এবং ফিনিল থাইলামিন এগুলোর জন্যই প্রেমিকা বোকাবোকা হাসি হাসে, প্রেমিকের মুখোমুখী হলে বুক টিপ টিপ করে কাঁপে, ঘামতে শুরু করে হাত পা।[১৩]

লায়লী-মজনুর ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটি ঘটেছে। তারা উভয়ে অস্থির হয়েছে 'অস্থির দোহান দেহা'[১৪] তারা শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থেকেছে ঠিকই কিন্তু পাঠে মনোযোগ দিতে পারেনি। কারণ 'ক্ষেণে পাঠে দৃষ্টিযোগে/ ক্ষেণে হেরএ চাঁদ-বদন।'[১৫] 'প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল উৎস'[১৬] মানব সৃষ্টির মূলেও প্রেমেরই কারাসজি। সৃষ্টিকর্তা ভালোবেসেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। লায়লী-মজনুর এ প্রেম 'কাম-গন্ধহীন' প্রেম। এ প্রেম *বৈষ্ণবপদাবলি*'র রজকিনীর মতো 'রজকিনী প্রেম /নিকষিত হেম/ কামগন্ধ নাহি তায়।' প্রকৃত অর্থে কাম ও প্রেমের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। 'আসলে কাম, প্রেমের একটা সম্পূরক বিষয়মাত্র। কাম-চৈতন্য দেহসর্বস্ব এবং আদি-ভোগবাদী। কামের সাথে দেহের সম্পর্ক আর প্রেমের সাথে আত্মার, অস্তিত্বের, প্রগতির।'[১৭] কাম দেহী আর প্রেম বিদেহী। প্রেম নর-নারীর দেহজ কামনা-বাসনাজাত একটি বিষয়। বৈষ্ণব দর্শনে বলা হয়েছে 'লৌহ আর হেমের মধ্যে যে ব্যবধান কাম ও প্রেমের মধ্যেও তাই।'[১৮] জৈব প্রবৃত্তি বা যৌন আকর্ষণই একমাত্র প্রেমের উৎস নয়। '...যখন কোন বিশেষ নর-নারীর চিত্ত পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট, নিবিষ্ট হয় তখন মিলনাকাঙ্ক্ষায় তাদের অন্তরে দাহ ও ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে। মানব হৃদয়ে সেই অনুভূতিকেই প্রেম বলা হয়।'[১৯] লায়লী ও মজনু পরস্পর প্রেমাসক্ত হয়ে জীবনের সুখকে বিসর্জন দিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে 'যাবৎ জীবন প্রেম না করিমু ভঙ্গ।/প্রেমের অনলে তনু করিমু পতঙ্গ॥'[২০]

লায়লী-মজনুর প্রেমের প্রথম বাধা আসে লায়লীর মায়ের দিক থেকে। তাদের প্রেম জানাজানি হলে লায়লীর মাতা তাকে ঘরে বন্দি করে রাখে। বন্দিনী লায়লীকে মজনু শুধু একটু চোখের দেখা দেখতে গিয়ে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও প্রহৃত হয়। বন্দিজীবনে লায়লীর মর্মভেদী কান্না ইট-পাথুরে দেয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে বার বার। মজনুর মনের অবস্থা 'ঘরে বড় জঞ্জাল বাহিরে গেলে দুখ/পিরীতি করিলে জীবনে নাহি সুখ॥'[২১] আশাহত মজনু তখন সমাজ, সংস্কার ও মানুষের প্রতি অনেকটাই বীতশ্রদ্ধ। সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কারের সঙ্গে মানবতার দ্বন্দ্বই মজনুর অন্তর্দ্বন্দ্বে রূপ নিয়েছে। যে সমাজ ভালোবাসার মূল্য দিতে জানে না। ভালোবাসার জন্য লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হতে হয়, সেই সমাজ ও সংস্কার কীসের প্রয়োজন? তাই সমস্ত সংস্কার ও সমাজের বন্ধন সে ছিন্ন করেছে, শরীরের সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে সে যেনো প্রতিবাদী হয়েছে। লায়লীর বিরহে মজনুর মন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। অস্বাভাবিক মানসিক চাপ ও অনাকাঙ্ক্ষিত পীড়নের ফলে মজনুর মনোজাগিক স্তরে বৈকল্য দেখা দিয়েছে। মজনুর এ মনোবৈকল্য মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

> একটানা পীড়ন ও চাপের ফলে ব্যক্তির অভ্যন্তরে রক্তের উপাদানে পরিবর্তন আসতে পারে এবং তার জৈব-রাসায়নিক পদার্থের এমন পরিবর্তন ঘটতে পারে, যা তার মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলী বিঘ্নিত করে তুলতে পারে। ফলে দৈহিক কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন নষ্ট হয় এবং দেহ ও মনের প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াসমূহ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে। শারীরিক প্রতিক্রিয়া যেমন ত্রুটিপূর্ণ হয়, তেমনি যথার্থ প্রত্যক্ষণ, যুক্তিপূর্ণ চিন্তন ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়।[২২]

মজনুর এ মনোবেদনার কোনো সমব্যথীও নেই আর তাই সে হয়েছে নিভৃতচারী। লায়লীকে না পেয়ে জীবনের মায়া-মমতা ভুলে মজনু নগ্নবেশে নজদ বনে গিয়ে হয়েছে 'বনবাসী আত্মনাশী উন্মত্ত উন্মাদ।'[২৩] পরবর্তীতে লায়লীকে পাবার একটি নিশ্চিত পথ তৈরি হলে লায়লীর কুকুরের গলাধরে তার গুণকীর্তন করে সেই পথও বন্ধ করলো মজনু নিজে। ভালোবাসার মানুষের তুচ্ছ জিনিসও প্রিয়। এক্ষেত্রে মজনু নিজের চেয়ে কুকুরকে ভাগ্যবান মনে করেছে 'এহি পদে পরশিছ লায়লীর দ্বার॥'[২৪] অথচ 'পরশিতে সেই দ্বার মোর ভাগ্য নাই।'[২৫] আপাত দৃষ্টিতে এ ঘটনা মজনুর পাগলামি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে লায়লীকে গভীর ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ এটি। ফলে নিদারুণ বিরহের কালো মেঘ তাদের জীবনাকাশকে ঢেকে দিয়েছে। বিরহ হলো 'প্রেমের সর্বোত্তম অংশ'।[২৬] প্রকৃতপক্ষে বিরহ পর্যায়েই প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমাস্পদকে মর্মে মর্মে অনুভব করে। কাছে না পাওয়ার বেদনার ফলে নর-নারীর মনে সূক্ষ্মতম ভাবগুলো বিকশিত হয়। মধুর সংগীত ও কাব্যের সৃষ্টি মানব হৃদয়ে রিক্ততা থেকেই। বিরহ বেদনার হলেও সে বেদনাও এক রকম আনন্দ দেয়। যাকে এরিস্টটল 'ক্যাথারসিস'[২৭] বলেছেন। যে কারণে ট্রাজেডিও আমাদের আনন্দ দেয়। বিচ্ছেদের কারণে তাদের জীবন বিষাদে ভরে গেছে। কাব্যে এই বিষাদই 'বিলাপ' আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ''লায়লী ও মজনুর প্রেম বিরহেই অবসিত। দুই দগ্ধ হৃদয়ের যন্ত্রণা জমাট হয়ে আছে এ কাব্যে। 'হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া কান্দিতে জনম ভেল'-লায়লী ও মজনুর জীবনে এ তত্ত্ব প্রমাণিত সত্য।

আলোচ্য কাব্যে বিরহানলে দগ্ধ দুটো হৃদয়ের জ্বালা-যন্ত্রণার ইতিকথা পরিব্যক্ত।"[২৮] দিন যায়, মাস যায়, বছর অতিবাহিত হয় কিন্তু তাদের বিলাপের শেষ হয় না। প্রেমের স্পর্শে মানুষের সুপ্ত চেতনা জাগ্রত হয়, তার পৃথিবী প্রকৃতি ও পরিবেশ প্রেমের মায়াজাল স্পর্শে অপূর্ব হয়ে ওঠে। মজনু নির্জন নজদ বনে মনুষ্য সমাজ থেকে দূরে প্রকৃতির মাঝে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। মজনুর এ সিদ্ধান্তকে আত্মবিনাশী মনে হলেও এর মধ্যে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। 'প্রেম সে কি কৃপণতা জানে,/ আত্মরক্ষা করে আত্মদানে'[২৯] মজনু এক অর্থে আত্মদানই করেছে। নারী প্রেমের মোহনীয় ক্ষমতা এতই প্রখর ও তীব্র যে শুধু আঁখির ইশারায় লক্ষ যুগের সাধনা ও তপস্যা নিমেষেই ধূলির সাথে মিশে যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে D. H. Lowerence বলেন:

> But them cane another hunger very deep and ravening. The very body's body crying out with a hunger more frightening and profound than stomach or thoat or even the mind; Redder than or death, more clamorous the hunger for the women-'[৩০]

অশ্রু বিসর্জনে মজনুর দিনের শুরু হয়। হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনি প্রকৃতির মাঝে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু আসে না শুধু তার প্রেয়সী। মনের গভীরে লুকানো ব্যথা তাই দীর্ঘশ্বাস হয়ে বাহির হতে চায়। বিরহী মজনুর অন্তর জুড়ে লায়লীর স্থান। আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) বলেন, 'সুরঞ্জনা, তোমার হৃদয় আজ ঘাস;'[৩১] ঠিক তেমনি মজনুর সমস্ত হৃদয় জুড়ে লায়লীর অধিষ্ঠান। সব সময় সে লায়লীর ধ্যানে মগ্ন। সকাল থেকে দুপুর; দুপুর গড়িয়ে বিকেল; বিকেলের পর প্রকৃতির মাঝে নেমে আসে সন্ধ্যার প্রশান্তি; সন্ধ্যার পর অন্ধকারের বুক চিরে প্রকৃতির বুকে জেগে ওঠে একখণ্ড রূপালি চাঁদ। জ্যোৎস্নার বন্যায় প্রকৃতির মধ্যে নেমে আসে স্নিগ্ধতা। তখনও মজনু ধ্যানমগ্ন। সে লায়লীর জন্য হাহাকার করে আকাশ বাতাস মুখরিত করেছে। এমন অবস্থায় মজনুর 'শরীর নগরে তান লাগিল ফাটক।/কাম ক্রোধ প্রবেশিতে হইল আটকা।'[৩২] 'কামুকের এক চোখ আর প্রেমিকের থাকে শত চোখ। শত চোখে সে তার প্রিয়তমাকে দেখে, রূপসুধা পান করে মুগ্ধ হয়। বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-রহস্যকে সে অনুধাবন করে, সকল সৃষ্টির এবং সকল জীবনের নিগূঢ় তাৎপর্য তাকে বিস্মিত করে। দৃশ্যমান সবকিছু তার কাছে হয়ে ওঠে বহুবিধ অর্থে অর্থবহ।'[৩৩] মজনুর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সুফিমতে ষড়রিপু যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য হৃদয়কে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও রুগ্‌ণ করে। আর এমন অবস্থায় আল্লাহর দিদার লাভ অসম্ভব। তাই শুদ্ধ প্রেম সাধনের জন্য দরকার শুদ্ধ মনের। 'অন্তর শুদ্ধি বিদ্যাকে বলা হয় এলমে তাসাউফ।'[৩৪] আধ্যাত্মিক সাধকগণ প্রেমকে একান্ত সাধনার জিনিস বলেই মনে করে। 'আত্তার বলেন, 'Allah is the real object of all love' আত্তারের মতে, পার্থিব প্রেমে অর্থাৎ নর-নারীর মর্ত্য প্রেমেও ঈশ্বর লাভ হতে পারে।'[৩৫] এ প্রেমের জন্য একাগ্রতা অপরিহার্য। মজনুও প্রেমের জন্য সাধনা করেছে। তবে এ সাধনার প্রকৃতি আলাদা। মজনুর দেহোত্তর প্রেম আস্তে আস্তে ভূমি ছেড়ে ভূমায় নেমে এসেছে। শামদেশে যাবার সময় লায়লী মজনুর কাছে গিয়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। কিন্তু মজনুর প্রেমের উপলব্ধি ইহলোকের সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। কবি দাদ আলী মিঞা'র (১৮৫২-১৯৩৬) *ভাঙ্গাপ্রাণ (১৯০৫)* কাব্যগ্রন্থের কবিতায় বেদনার, হাহাকার ও উদাসিনতার সুর প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)-এর *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫) উপন্যাসে চন্দ্রশেখর স্ত্রীর মৃত্যুতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সংসারের অসারত্বকে উপলব্ধি করেছেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) *সাধের আসন* (১৮৮৮) কাব্যগ্রন্থে জগৎ-সংসারকে প্রিয়ার আসনে দেখেছেন। *লায়লী-মজনু* কাব্যে বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। বিরহী লায়লী-মজনুর হাহাকার ধ্বনি এ কাব্যের উপজীব্য। সমাজ সংস্কারকে উপেক্ষা করে লায়লীকে গ্রহণ করা মজনুর পক্ষে সম্ভব হয়নি। নিছক জৈবিক চাহিদার জন্যই তো দেহের প্রয়োজন। প্রকৃত প্রেমের অবস্থান মনে, আত্মায়। '...কামের সীমা শরীর দ্বারাই সীমায়িত। আর প্রেম! যার কোনো যুক্তি নেই, অবয়ব নেই, অসীমে অসহায় এক আদি-অন্ত আধুনিক প্রত্যয়।'[৩৬] স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মজনুর এই নিষ্ক্রিয়, ভীরু বা মৌন আচরণ দেখে আমরা তাকে দুর্বল চরিত্রের নায়ক হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। রোমান্সধর্মী কাব্যের অন্যান্য নায়ক যেভাবে পাহাড়সম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে দয়িতাকে লাভ করেছে মজনুর ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায় না। রোমান্টিক প্রণয়ধারার নায়ক লোর চন্দ্রানীকে হরণ করেছে, কিন্তু মজনু লায়লীকে ফিরিয়ে দিয়ে মহৎ প্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অতিমানবীয় হয়েছে। মজনুর এ আচরণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর বাণীকেই স্মরণ করিয়ে দেয় 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলিয়া দেয়'। সপ্তটঙ্গিতে চিত্রিত কামোদ্দীপক চিত্র ও নগ্নদেহী জোলেখার কামনার আহ্বানে ইউসুফ হয়তো সাড়াই দিতো যদি না দৈববাণী হতো। কিন্তু মজনুর ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। সে প্রেম করেছে কিন্তু প্রেমের জন্য কোনো কষ্ট স্বীকার বা সাহসী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাই তার জীবন পর্যবসিত হয়েছে বিলাপে। ট্রাজেডির নায়ককে আমরা চিত্তহারা, আত্মনিধনকারী, হতাশায় মুহ্যমান অবস্থায় দেখতে চাই না; সে দুঃখ পাবে, তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরবে, তবু শোকে ভেঙ্গে পড়বে না, দুঃখের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। অবিচল ও অবিরত সংগ্রাম হবে তার জীবনের মূলমন্ত্র। প্রথমে দেহী রূপে লায়লীকে পেতে চাইলেও পরবর্তীতে লায়লী অশরীরী রূপে মজনুর সমগ্র অন্তর্লোকে ছড়িয়ে পড়েছে। তার বাহ্যিক দেহের কামনা হয়েছে তুচ্ছ। লায়লীর প্রেমসত্তার অধিষ্ঠান বিশ্বময় এবং মজনু সেই বৃহতের সন্ধান পাওয়ায় মানবী লায়লীর প্রয়োজন তার কাছে গৌণ হয়েছে। প্রেমের এই পরিণতি স্বতঃস্ফূর্ত। তত্ত্বের

ভাষায় আধ্যাত্মিক প্রেম, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেম। পরমকে ধরার জগতে বস্তুরূপে পাওয়া অসম্ভব কেবল ধ্যানের জগতে তাকে উপলব্ধি করা যায়। ধ্যানসিদ্ধ পুরুষই তার সন্ধান পায়। তার প্রেম সান্নিধ্য ও প্রেমাস্বাদন করতে পারে।

লায়লী-মজনুর মতো *শিরি-ফরহাদ* বিষাদাত্মক প্রেমকাহিনি। পাথর খোদাইকারী যুবক ফরহাদ প্রণয়াসক্ত হলো সম্রাটকন্যা শিরির। দিনমজুর ফরহাদকে বাদশাহ প্রস্তাব দিলেন পাহাড় কেটে ওপারের নদীর স্রোতধারা এপারে প্রবাহিত করতে পারলে শিরি তার হবে। ফরহাদ কুড়াল নিয়ে উত্তুঙ্গ পাহাড় কেটে নহর তৈরি করতে লাগলো পাষাণের গায়ে প্রেমিকার মূর্তি এঁকে। প্রেমের সাধনা দুস্তর, একাগ্রসাধনা কোনো দিন পরাজয়কে মেনে নেয় না। প্রেমমন্ত্রে উজ্জীবিত ফরহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে অসম্ভবও সম্ভব হলো। কিন্তু শিরির মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে সে হলো আত্মবিনাশী। প্রেমের জন্য ফরহাদের এমন অকৃত্রিম আকুতি ও আত্মহুতি নিঃসন্দেহে প্রেমমাহাত্ম্য ও অপূর্ব সৌন্দর্যের স্বাক্ষর বহন করে। মজনু চরিত্রে প্রেমের জন্য ফরহাদের মতো সংগ্রাম না থাকলেও সে ফরহাদের মতো আত্মবিসর্জনের পথই বেছে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য:

> মজনুর প্রেম বিশ্বাসে নিষ্ঠা আছে, অবিচলতা আছে, কিন্তু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আলোড়ন নেই, উজ্জীবন নেই। অর্থাৎ তার মধ্যে Suffuring আছে কিন্তু doing নেই। সে কেবল কাঁদতে জানে কাঁদাতে জানে না। তার জন্য আমাদের মায়া জাগে, করুণা জাগে, শ্রদ্ধা সমবেদনা জাগে না। প্রেমের জন্য ফরহাদ যেভাবে হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করেছে মজনুকে আমরা তেমন সংগ্রামী হিসেবে দেখতে পাই না।[৩৭]

এ কাব্যে লায়লীও বিরহিণী। লায়লীর বিরহ মজনুর চেয়ে কোনো অংশ কম নয়। মজনু লায়লীকে না পেয়ে স্বেচ্ছায় নির্জন বনবাস গ্রহণ করেছে কিন্তু লায়লী সংসারে থেকেই সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে। লায়লী যেনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রামী প্রেমিকা:

পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ, আমি আছি।[৩৮]

লায়লী প্রেম সাধনায় বিজয়িনী। তাকে প্রেমের পথে অনেক দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়েছে। আত্মসুখ, প্রবঞ্চনা ও প্রলোভন কোনো কিছুই তাকে পবিত্র প্রেমের পথ থেকে বিচ্যুৎ করতে পারেনি। *বৈষ্ণবপদাবলি*'র রাধা ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কারের চেয়ে হৃদয়কেই প্রাধান্য দিয়েছেন:

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥[৩৯]

লায়লীর অবস্থাও হয়েছে তদ্রূপ; মাতার শাসন-গর্জন, সমাজক-সংস্কার ও রীতিনীতি সবকিছুকে সে দুপায়ে দলে প্রেমের জন্য সংগ্রাম করেছে। 'লায়লী-মজুন কাব্য *রোমিও-জুলিয়েট* নাটকের মতোই একটি ট্র্যাজেডী। এদের মিলনে বাধা হয়েছে সমাজ, শাস্ত্র ও পরিবার।'[৪০] লায়লীর পিতামাতা ছলনা করে লায়লীকে অন্যত্র বিয়ে দিলে সে নববিবাহিত স্বামীকে (ইবন্‌সালামের পুত্রকে) পদাঘাত করে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রেমের ব্যাপারে মজনু অপেক্ষা লায়লীই অধিক সক্রিয়। সমাজ সংসার ও লোক-লজ্জার ভয় না করে সে ছুটে গিয়েছে নজদ বনে। *ময়মনসিংহ গীতিকা*'র মহুয়া, কাজল রেখা, দেওয়ানা-মদিনা প্রভৃতি চরিত্রের মতো লায়লীর প্রেমে গভীরতা লক্ষ করা যায়। 'যে প্রেম সাধনালব্ধ, যে প্রেমের জন্য মানুষ অক্লেশে আত্মোৎসর্গ করতে যায় সেই প্রেম অসাধ্য সাধন করতে পারে।'[৪১] দুঃখের আগুনে পুড়ে তার প্রেম পরিণত হয়েছে খাঁটি সোনায়:

জীবন অবধি দুঃখ না হৈল নিবার।
মরণে সে দুঃখ হন্তে হইমু নিস্তার॥
আনন্দে মিলিমু এবে নিজ কান্ত সনে।
কৌতুক ভুঞ্জিমু এবে হরষিত মনে॥[৪২]

বাংলা সাহিত্যে অনেক নারী চরিত্র রয়েছে যারা প্রেমের ক্ষেত্রে লায়লীর চেয়েও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছে। তারা শুধু প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বিলাপই করেনি বরং প্রয়োজনে প্রেমিকের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিকূল পরিবেশের জন্য সংগ্রাম করেছে। লায়লী প্রেমে সক্রিয় হলেও তার চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য:

> লায়লী-মজনু উচ্ছ্বাসপ্রধান কাব্য; হৃদয়াবেগই এর প্রাণ। সেজন্যে এ কাব্যে চরিত্র গড়ে ওঠেনি। কএস-লায়লী দু'জনই পরম সজ্জন। প্রণয়ে একনিষ্ঠতা ছাড়াও পিতামাতা, সমাজ-ধর্ম, রীতি-নীতি প্রভৃতির প্রতি গতানুগতিক আনুগত্যে তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত। দুজনেই জীবন-চেতনার ক্ষেত্রে প্রেমিকা এবং সে কারণে দুজনেই অসূয়ামুক্ত, উদার ও তিতিক্ষু।[৪৩]

বিরহিণী লায়লী মজনুর অপেক্ষায় দিন কাটাতে থাকে। দিন যায়, মাস যায়, বছর অতিবাহিত হয় কিন্তু তার প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয় না। লায়লী মজনুকে ছাড়া এ সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায়নি। তাই হেমন্তকালে লায়লীর বিরহতপ্ত দেহে নেমে

এসেছে প্রশান্তির মৃত্যু। মৃত্যুকালে মায়ের নিকট তার অন্তিম আবেদন:

যে ক্ষণে শরীর তেজি আহ্মি চলি যাই
বার্তা জানাইবা মোর মজনুর ঠাঁই।
কহিবা তোহ্মার ভাবে লায়লী দুঃখিনী
জন্মিল পিরীতি-পীড় হারাইল প্রাণি।[৪৪]

লায়লীর মৃত্যুর খরব শুনে মজনু বিলাপ করেছে 'পাইয়া পরশমণি হেলাএ হারাইলু।/আপনা করম দোষে আপনা খাইলুঁ॥'[৪৫] লায়লীর কবরে বিলাপরত অবস্থায় মজনুর মৃত্যু হয়। সামাজিক ও পারিবারিক বাধাই লায়লী ও মজনুর প্রেমের পথে প্রধান অন্তরায় হয়েছে।

প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহের করুণ হাহাকার ও মর্মস্পর্শী আর্তনাদ এ কাব্যের প্রায় সর্বত্রই লক্ষ করা যায়। বিষাদাত্মক এ কাব্যে নায়ক-নায়িকার প্রেমজীবন ব্যর্থতার মধ্যদিয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। মজনুর অন্তরে লায়লীর জন্য গভীর ভালোবাসা থাকলেও বাইরে রয়েছে ভয়; এ ভয় সমাজের, এ ভয় লোকলজ্জার। পবিত্র প্রেমের মহৎ দৃষ্টান্ত হিসেবে *লায়লী-মজনু* কাব্যটি বিরল। 'লায়লী-মজনু প্রেমের জগতে কিংবদন্তীর মত। তাদের প্রেমকথা আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার ও বিস্তার লাভ করে। ভারত এবং গ্রীসের পুরাকাহিনীতে প্রেমিক-যুগল অনেক আছে, কিন্তু মৌলিক কাহিনী হয়ে জগতবাসীর কাছে এমন আকর্ষণীয় কাহিনী, *লায়লী-মজনু* ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই।'[৪৬] এ কাব্যে প্রেমের জন্য নায়ক ও নায়িকার ত্যাগ ও তিতিক্ষা চরিত্র দুটিকে অপূর্ব মহিমায় মহিমান্বিত করেছে। তাদের প্রেম কাহিনি হয়ে উঠেছে বিশ্বসাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। প্রেমের জন্য নায়ক-নায়িকার মহৎ ত্যাগ বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ছাড়া অন্যত্র খুব কমই দেখা যায়। লায়লী এবং মজনুর প্রেমের সঙ্গে মিশেছে পবিত্রতা ও শালীনতা। পার্থিব কামনা-বাসনা নিয়েও প্রেমের এমন সৌন্দর্য তাই দুর্লক্ষ্য। মানুষ স্বর্গের দেবতাও নয় আবার নরকের শয়তানও নয়, তাই তার প্রেম হবে মানবিক। এতে থাকবে রূপতৃষ্ণা, অভিসার, কামনা-বাসনা, মান-অভিমান, বিরহ-বিচ্ছেদ, মিলন ইত্যাদি। লায়লী ও মজনু ত্যাগী ও সাধনায় দৃঢ় কিন্তু মজনু সংগ্রামের পথে না গিয়ে বৈরাগ্যের পথই বেছে নিয়েছে। প্রচলিত সমাজের রীতিনীতি, সংস্কার ও আত্মিক দ্বন্দ্ব প্রকটিত হবার কারণেই তার জীবনে হাহাকার ও করুণ পরিণতি ঘনিয়ে এসেছে। এ মাটির পৃথিবীতে লায়লী ও মজনুর প্রেম সার্থকতার পথ খুঁজে পায়নি। তাদের কাঙ্ক্ষিত মিলনের আশু সম্ভাবনার দ্বারও হয়েছে রুদ্ধ। সেদিক বিচারে লায়লী-মজনুর প্রেম অচরিতার্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত এ কথা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ বদিউর রহমান সম্পা., *সাহিত্য-সংজ্ঞা অভিধান* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০১), পৃ. ১৯৪

২ অমৃতলাল বালা, *পদ্মাবতী সমীক্ষা* (৩য় সং.; ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০০৮), পৃ. ২০-২১

৩ দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, *লায়লী-মজনু*, আহমদ শরীফ সম্পা. (অষ্টম মুদ্রণ; ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ২৭

৪ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ১ম খণ্ড (পু.মু.; ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০১০), পৃ. ২১৮

৫ আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (পু.মু.; ঢাকা: চারুলিপি, ২০২০), পৃ. ১১১

৬ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড (পু.মু.; ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০১১), পৃ. ১৬৩

৭ ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান* (৮ম সং.; ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৫), পৃ. ১৬৪

৮ দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, পৃ. ৪১

৯ মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য (*চতুর্থ মুদ্রণ; ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩), পৃ. ৬৮

১০ ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ১৩৯

১১ দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, পৃ. ৯৬

১২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নাট্যগীতি', *গীতবিতান*, (পু.মু.; কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৪০১, ১১৫ সংখ্যক গান), পৃ. ৮০৬

১৩ ওবায়দুল হক, ''মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে প্রেম'', *দৈনিক যুগান্তর*, ১০ এপ্রিল, ২০০২

১৪ দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, পৃ. ৯৬

১৫ *তদেব*

১৬ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন, *ধর্ম ও সমাজ* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৬৮), পৃ. ১৩৫

১৭ গাজী রফিক সম্পা., *কবিদের প্রেম* (ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ১২

১৮ আবুল হাসান চৌধুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতে প্রেমচেতনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ১৯৬

১৯ ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ৩৬-৩৭

[২০] দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, পৃ. ৯৮

[২১] *তদেব*, পৃ. ১১০

[২২] মঞ্জুর আহমদ, *অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান* (২য় সং.; ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৫৬

[২৩] দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, পৃ. ১৮২

[২৪] *তদেব*, পৃ. ১২৬

[২৫] *তদেব*

[২৬] সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ. ৬২

[২৭] মুহম্মদ আবুল ফজল, *নাট্যশিল্প ও বাংলা নাটকের প্রথম পর্যায়* (রাজশাহী: ইউরেকা বুক এজেন্সী, ১৯৯৬), পৃ. ৩৫

[২৮] দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, পৃ. ৪১

[২৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভীরু', ''বিচিত্রিচা'', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *রবীন্দ্র রচনাবলী-৩য় খণ্ড* (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৩), পৃ. ১৩১

[৩০] আতাউর রহমান, *নজরুল কাব্য-সমীক্ষা (*৩য় সং.; ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৪), পৃ. ৭৭, (উদ্ধৃত)

[৩১] জীবনানন্দ দাশ, 'আকাশলীনা', ''সাতটি তারার তিমির'', সফিউদ্দিন আহমদ সং. ও সম্পা., *কাব্যসমগ্র*, (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৯), পৃ. ২৩৩

[৩২] দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, পৃ. ১২৮

[৩৩] গাজী রফিক, পৃ. ১২

[৩৪] আবুল হাসান চৌধুরী, পৃ. ২৩৮

[৩৫] অবদুল হাফিজ, *বাংলা রোমান্স-কাব্য পরিচয়* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৬), পৃ. ৪০

[৩৬] গাজী রফিক, পৃ. ১২

[৩৭] ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ১৬২

[৩৮] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নির্ভয়', ''মহুয়া'', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *রবীন্দ্র রচনাবলী- ২য় খণ্ড* (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৭৯১

[৩৯] মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ সম্পা., *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা* (৮ম সং.; ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ১৮১ (২৯০ সংখ্যক, চণ্ডীদাসের পদ)

[৪০] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩

[৪১] আলাওল, *পদ্মাবতী*, দ্বিতীয় খণ্ড, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫), পৃ. ১৪

[৪২] দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, পৃ. ২১৪

[৪৩] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১

[৪৪] দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, পৃ. ২১৩-২১৪

[৪৫] *তদেব*, পৃ. ২১৯

[৪৬] ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ১৬৬